কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় সম্প্রীতি: একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

এইচ. এম. জালাল উদ্দীন চৌধুরী*

Abstract: Akbar the great, the sole ruler of the Mughal Empire, holds a special place in Indian history as one of its greatest emperors. Akbar was not only an uncontested leader, but the contemporary history of his time revolved around him. He believed in a philosophy that was both liberal and supremely tolerant. During the latter part of his reign, he adopted humanistic and nationalistic policies, introducing many fundamental reforms. He moved away from the traditional leadership of minority Indo-foreign and Muslim classes, instead embracing all classes of his subjects, becoming a truly "National Emperor" recognized by Indians as one of their own. One of Akbar's most notable contributions was the principle of different religion tolerance, or Sulh-i-Kul, which reflected his wise and inclusive mentality. However, his religious policies also sparked controversy and criticism. Practically, he rose above the narrowness and communal bigotry of his time, establishing a new doctrine called Din-i Ilahi, or "Religion of God." This doctrine combined elements from all the religions of Indian society with the goal of fostering world fraternity, reducing religious discrimination, and ensuring the stability of the Mughal Empire through social and political integration. Din-i Ilahi was not a religious discipline; rather, it was a cultural-political ideology. Akbar's ideals, along with his popular policies, particularly his religious philosophy, played a significant role in the stability and unity of the Mughal Empire.

ভূমিকা

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র ক'জনই "মহামতি" শাসক হিসেবে বিবেচ্য হন। তন্মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত দু'জনের অবস্থান সবার শীর্ষে-একজন সম্রাট অশোক, অন্যজন সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)। একজন শান্তি ও বিশ্বজনীন প্রেমের প্রবর্তক ছিলেন, অন্যজন "সুলহ্-ই-কুল" নীতি গ্রহণ করে সর্বজনীন শান্তি ও সাম্যের বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্রাট আকবর নিজ ধর্মের বিপরীতে গিয়ে রাজদণ্ড পরিচালনায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নীতির সর্বাপেক্ষা উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তাঁর খ্যাতি নিরাপদে নির্ভর করছে বিচিত্র সহজাত প্রতিভা, মৌলিক চিন্তাধারা এবং সংস্কারসমূহের উপর। মুসলিম শাসনামলে আকবর একক ভারত-আত্মা আবিষ্কার করেছেন। তিনি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাটের পরিণত হন। (Srivastava, 1972:486) নানা দিক থেকে ভারত ভূখণ্ডে নবযুগ প্রবর্তনে তিনি পুরুধা হিসেবে বিবেচিত হন। তাই বলা হয় "He was not only the child of his century he was it's best replica", (Majumdar, 1967:451) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আকবরই প্রথম ও একমাত্র সম্রাট যিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে মুসলিম সমাজে যে ধারা বা নিয়মানুবর্তিতা প্রচলন ছিল তার গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছেন । আলোচ্য প্রবন্ধে সম্রাট আকবরের ধর্ম-দর্শন কিভাবে

* লেকচারার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল, সমাজ ও রাজনীতিতে সেটির কি প্রভাব পড়েছিল, সে বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় কি ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কেও একটি মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

মোগল শাসনামল ও আকবরের সময়কাল নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে এইসব রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- *আকবরনামা, আইন-ই- আকবরী, মুন্তাখাব-আত্-তাওয়ারিখ, তবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-রশিদী, তাজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াত, তাকমিনা-ই-আকবরনামা, তারিখ-ই-ফিরিস্তা, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, তুজুক-ই-বাবরী, হুমায়ুন নামা, রাজপুতনা কা ইতিহাস,* এছাড়া মোগলদের গেজেটিয়ার *দস্তুর-উল-আমল* ও ধর্মীয় সাহিত্য *মাল-ই-জুজাৎ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পর্যটকদের বিবরণীর মধ্যে ফাদার এ্যান্টনিও মনসারেট এর *মুঙ্গেলিকা লিগেশিয়ানিশ কমেন্টারিস্* ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ ইংরেজি ও কয়েকটা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকগন যাঁরা আকবরের সময়কাল নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন S M Edwards and H L O Garrett, Stanley Lane- Poole, V A Smith, G B Malleson, Elphinstone, Count Von Noer, Moreland, Lawrence Binyan, P Kennedy, I Goldzihar, R P Tripathi, Beni Prasad, S M Zaffar, P Sharma, L P Sharma, S A Q Hussaini, Mohammad Mohar Ali, I H Qureshi, Muhammad Mujib, S B P Nigam, Yousuf Hussain, Ibn Hasan, Ishwari Prasad, R C Majumdar and others, S Rizvi, মুসা আনসারী, এ কে এম আব্দুল আলীম, এ কে এম শাহনেওয়াজ প্রমুখ। এঁদের রচনায় আকবরের দরবার ও দরবারের বাইরের জীবনাচার, শাসন প্রণালী, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা বিশেষত তাঁর ধর্মনীতি ও এর প্রবাহমানতা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। উপরিউক্ত উৎসগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ধারাবাহিক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন'শ বছর পর সম্রাট আকবর ক্ষমতায় এসে তৎকালীন যুগ-পরিবেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিমূল নিয়ে যে চিন্তা ও গবেষণা চালান তার প্রেক্ষাপট, প্রায়োগিক কর্ম-পদ্ধতি ও চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও আকবর তাঁর "সুলহ-ই-কুল" নীতি ও "দ্বীন-ই-ইলাহি" নামক মতবাদ দিয়ে সকল সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সফলকাম হন। এতে করে একদিকে তিনি মহামতি শাসকে পরিণত হন এবং অন্যদিকে যুগোত্তীর্ণের আবেদন নিয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে ঘোষিত হন। সম্রাট আকবরের ধর্মীয় সম্প্রীতির নানাবিধ দিক সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

(ক) আকবরের ধর্মীয় চিন্তার উৎসের পটভূমি অনুসন্ধান।

(খ) সুলহ-ই-কুল, ইবাদতখানা, মহজরনামা ও দ্বীন-ই- ইলাহি ঘোষণার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ।

(গ) মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আকবরের ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রভাব ও বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মীয় উন্মাদনা বিকাশের বিপরীতে তাঁর নীতির উপযোগিতা মূল্যায়ন।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। এখানে Causes and Effect, Qualitative Research অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের বিপরীতধর্মী বক্তব্যের সূত্র ধরে দ্বৈতীয়িক গ্রন্থ প্রণেতাগণও আকবরের ধর্ম-দর্শন নিয়ে দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে পরস্পর বিরোধী আলোচনার একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় সম্প্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ

আকবর যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকতর রূপে ভাবপ্রবণ হয়ে যেতেন, তাঁর তাজকীরা গভীরভাবে অনুধাবন করলে সহজেই অনুমিত হওয়া যায় যে, তিনি কোনো সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে কোনভাবেই বলা যায় না যে, তিনি একজন 'নৈরাজ্যবাদী রক্ষণশীল' ছিলেন, বরং তাঁকে 'সংস্কারবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করায় সমীচীন। তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের একটি নতুন প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করতেন। (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৫৮) আকবর অনায়াসে ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা তাঁর প্রদানত করেছিলেন । তবে লক্ষণীয় যে, মুসলিম রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্য অধিগ্রহণ নীতি এবং হিন্দু রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করাই ছিল আকবরের রাজনৈতিক আদর্শের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে একমাত্র ও একজন মুসলিম শাসক থাকবেন, তিনিই হবেন মুসলিম মিল্লাতের সার্বভৌম অধিপতি। অন্যদিকে হিন্দু রাজাদের আনুগত্য লাভের ফলে সম্রাট আকবরের "পাদশাহি" বা সার্বভৌম আদর্শ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এই পাদশাহিকে সুদৃঢ়করণে তাঁর একটি নির্ণয়ী পদক্ষেপ ছিল স্বায়ত্তশাসিত হিন্দু রাজ্যসমূহকে সাম্রাজ্যের মূল অঙ্গ বা শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এই প্রসঙ্গে বলা হয়, The admission of the independence Hindu state as integrate parts of the empire and the disappearance of the Muslim State where importance factors in strengthening the position of the Delhi monarchy. (Tripathi, 1963:336) দূরদর্শী আকবর এই ধারাবাহিকতায় ১৫৮২ সালে পারসিক 'নওরোজ' উৎসবের আদলে আরেকটি ভূমিরাজস্ব কেন্দ্রিক নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অভিজাতবর্গ সম্রাটকে সার্বভৌম শক্তিরূপে সিজদার মাধ্যমে এই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে অভিবাদন জানান। তখন থেকে আকবর সিংহাসনে দৈব অধিকার বা divine right দাবি করতে থাকেন। এখানে এই ব্যাখ্যাটি দেয়া হয় যে- রাজা হলেন আল্লাহ বা ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট এবং ঈশ্বরের দান kingship in the gift of God । এই সময় তাঁকে 'দিল্লিশ্বরোবা' বা 'জগদীশ্বরোবা' The lord of Delhi is the lord of world হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। আর পি ত্রিপাটির মতে আকবর শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সার্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা পোষণ করতেন (World sovereignty and universal empire)। (Tripathi, 1963:337) তিনি চেঙ্গিস ও তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে মধ্য এশিয়া, পারস্য, আনাতোলিয়া ও আরব দেশ জয় করে ভারতীয় রাজতান্ত্রিক আদর্শকে দেশীয় থেকে

বিশ্বজনীন করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর শাসনতন্ত্রের মৌলিক বিন্যাস ছিল পিতৃতান্ত্রিক। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তানের মত করে শাসন করতেন। রাষ্ট্রের তথা প্রজাস্বার্থই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য। এইজন্য মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। বিশ্বজনীন রাজতান্ত্রিক আদর্শের দুর্লভবোধ অনুযায়ী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম-স্বাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাঁর ধর্ম সহিষ্ণুতা বা সুলহ্-ই-কুল নীতি ছিল রাজনৈতিক দর্শনের অনুষঙ্গী। তাঁর এই চেতনা মধ্যযুগীয় গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমান একবিংশ শতকেও সমভাবে আবেদন রেখে চলেছে। এই জন্য আকবরকে সর্বকালের আধুনিক মনোভাবাপন্ন সম্রাট হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সম্রাট আকবরের জীবনচক্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর ধর্মনীতির সামগ্রিকতাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

(ক) ১৫৫৬ থেকে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, একজন সুন্নি মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন।

(খ) ১৫৭৪ থেকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তাঁর মনোগভীরে ভাবান্তর দেখা দেয়ায় ধর্ম সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা বা মতবাদ দানা বেঁধে উঠে ।

(গ) ১৫৮২ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, ইসলাম ধর্মের বাইরে গিয়ে তিনি "দ্বীন-ই-ইলাহি" নামে একটি নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচারে একনিষ্ঠতার পরিচয় দেন। (Smith, 1914:348)

সম্রাট আকবর ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের নিজের করে নিয়ে অসাধারণ দক্ষতায় সাম্রাজ্য পরিচালনা করে বহুল প্রশংসিত হয়েছেন। ঠিক বিপরীত গণ্ডিতে ধর্মনীতির কারণে তিনি অধিকতর সমালোচিতও হয়েছেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন ইতিহাসবিদ আব্দুল কাদির বদায়ূনি। আকবরের একদা স্নেহধন্য, গোঁড়া স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতদের কঠোর সমালোচক, বদায়ূনী শেষ অবধি আকবরের উদার ধর্মীয় মতের সাথে তাল মিলাননি। (আনসারী, ১৯৯২:৫৭) তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'মুন্তাখাব-আল-তাওয়ারিখ'* এ আকবরের ধর্মনীতির বিকাশ ধারার পর্যায়ক্রমিক স্তরের সবিস্তার কার্যক্রমের ধারাবাহিক ঘটনাবলি প্রকাশ করেছেন। যেমন-আকবরের ইবাদত খানা প্রতিষ্ঠা, আলিমদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে মতবিনিময়, তাঁর মহতী ধর্মসভায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের পণ্ডিতদের অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সাথে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধনে আকবরের আকাঙ্ক্ষা, দরবারের পণ্ডিতদের স্বাক্ষরিত মহাজরনামা গ্রহণ ও শেষ পর্যায়ে তৌহিদী মতাদর্শের ঘোষণা ইত্যাদি ক্রম-স্তরসমূহ বদায়ূনী তাঁর গ্রন্থে অনেকটা প্রক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনা তুলে ধরেছেন। (Badauni, 1925:103) তিনি ঘটনাসমূহ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির নিরিখে অবলোকন ও উল্লেখ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। কাজেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা আকবরের রাষ্ট্রীয় নীতি-পদ্ধতির পরিবর্তনের সমগ্রতার অংশ হিসেবে বর্ণিত হয়নি। ঐতিহাসিক কার্যকারণ সূত্রে এসব ঘটনা গ্রথিতও হয়নি। তবে ঘটনাগুলোর নেপথ্যে মানবীয় ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন অন্যকোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সক্রিয় নয়- এই ব্যাপারে তিনি সচেতন (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৫৭)।

পক্ষান্তরে ইতিহাসবিদ আবুল ফজল ছিলেন আকবরের ধর্ম সমন্বয় বা সুলহ্-ই-কুল নীতির একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর মতে এই নীতি ছিল আকবরের জ্ঞানালোক মানসিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আবুল ফজল যদিও মানুষের জয় পরাজয় তার প্রকৃতি দিয়ে বিশ্লেষণ করেন, তথাপি তিনি আকবরকে দৈব ক্ষমতার অধিকারী একজন 'ইনসানে কামেল' হিসেবে চিত্রিত করেছেন। উপরন্ত আবুল ফজল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন 'জওহারে নফিসার' অধিকারী হিসেবে আকবর বিভ্রান্ত মানুষের পথ নির্দেশের জন্য এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে উদ্ভাসিত ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধ ও মঙ্গলকামনা থেকেই তাঁর উদার

ধর্মনীতি উৎসারিত হয়েছে। তাই তাঁর প্রতি অনুগত হওয়া প্রত্যেকের নৈতিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব (Fazal, 1907:44)। অবশ্য তাঁর লেখনীতে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় সম্রাটের ধর্মনীতির কোনো বিশ্লেষণ না থাকলেও ক্রমবর্ধমান মোগল সাম্রাজ্য সুসংহতকরণে পুরাতন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন স্টিল-ফ্রেম মনসবদারীর মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজনীয়তা তিনি একান্তভাবে অনুভব করেছিলেন (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৫৭)।

আকবরের ধর্মীয় ধ্যান ধারণার ব্যাপারে সমসাময়িক উপরোল্লিখিত দুই বিশিষ্ট জনের বিপরীতধর্মী মতামত বাস্তবিক অর্থেই কোন ব্যক্তিগত মতামত ছিল না, বরং তাঁদের এই ভিন্ন বক্তব্য তৎকালীন বিকাশ উন্মুখ মোগল রাজত্বের সামাজিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হয়। তবে তাঁরা দু'জন কোন ধারার মতামতের প্রতিনিধিত্ব করতেন - এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সম্রাট আকবর সমাজের এই বাস্তবতা, সামাজিক কাঠামোর স্তর ও শ্রেণীবিন্যাস সর্বোপরি গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক আকাঙ্ক্ষা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সম্রাটের এই চিন্তনের প্রকাশ্য ও জনকল্যাণ কামনার বাস্তবরূপ ছিল তাঁর ধর্মীয় সমন্বয় নীতিতে। ধর্মান্ধতাকে অগ্রাহ্য করে স্ব-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অধিকাংশের অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূলতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আকবর তখন যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন, মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনের ইতিহাসের মূল্যায়নে তা ছিল প্রকৃতই অমূল্য। কাজেই তাঁর সমন্বয়বাদী ধর্মচিন্তার পেছনে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াও আত্ম-জিজ্ঞাসাও সমভাবে ভূমিকা রেখেছিল। ফলে আকবরের ধর্মবিশ্বাসের আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কতটুকু প্রভাব ছিল তা অনেকাংশে আলোচ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। আকবর রাজনৈতিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে গিয়ে তাঁর ধর্ম চেতনাকে প্রকাশ্যে এনেছেন বলে মনে হয় । অবশ্য তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজের নির্ভরতা অটুট রেখে সমভাবে হিন্দু সমাজের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। তাই যুগের সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে সকল ধর্মের মূল কথা যে এক ও অভিন্ন, সেই সত্যকে ধারণ করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সম-ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে আকবর এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। ইবাদত খানা প্রতিষ্ঠার পর আকবর যখন নতুন মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তখন তার বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয়নি। সুতরাং পরিণত যৌবন বা প্রাক-পৌঢ় বয়সে তিনি বার্ধক্যদর্শাগ্রস্ত লোকদের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মত্ত হবেন তা কোনোক্রমেই স্বীকার্য নয়। আসলে অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মেধা ও মনন দিয়ে তিনি অনুধাবন করেছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। তাই তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য অর্জনের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিকে এগুতে থাকেন। মানবতাবাদী ও জাতীয়নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুসৃত সংস্কারাদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে তিনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জাতীয় সম্রাটের পরিণত হন। ফলে আকবরের গ্রথিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ভঙ্গুর অবস্থার মধ্য দিয়েও ভারতবর্ষে তিনশত বছর ধরে মোগল শাসন তথা মুসলিম শাসন টিকে গিয়েছিল।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায় আকবরের ধর্মনীতির উৎস নির্ণয়ে যেসব বক্তব্য পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ক) আকবর বংশগত ঐতিহ্যে প্রভাবিত ছিলেন। আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লং এর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ধর্মান্ধ বা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। এ ধারাবাহিকতায় দাদা বাবুর-ই-আজম ও পিতা হুমায়ুন সংস্কৃতিবান ও উদার মনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে মেবারের বীর শাসক রানা সংঘকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর রানা সংঘ প্রতিষ্ঠিত রাজপুত সংঘকে গুঁড়িয়ে দেন। কিন্তু সম্রাট বাবুর রানা সংঘের কন্যা পদ্মাবতীর শৌর্য-বীর্য দেখে তাঁকে নিজ কন্যার মর্যাদা দিয়ে চিতোর দুর্গ ফিরিয়ে দিয়ে এক নতুন সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বাবুর

ধর্মনিরপেক্ষ নীতি নিয়ে রাজপুত ও আফগান তথা হিন্দু-মুসলিম প্রজাদের প্রতি সহনশীল মনোভাব প্রদর্শন করেন। যাযাবর চাঘতাই তুর্কি শক্তিকে ভারতীয়করণ করে তিনি ভারতবর্ষে এক নতুন সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন। তাই বলা হয় The seeds of his (Akbar's) policy were sown by his illustrious grandfather (Tripathi, 1963:343)।

খ) অমরকোটের রাজপুত রাজা রানাপ্রসাদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী আকবর শিশুকাল থেকে বিস্তৃত জগতের সাথে পরিচিতি পান। কৈশোরেরও তিনি তুর্কি, আফগান ও পারসিকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি রাজপুত রমণী বিয়ে করে তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী বিন্দুসমূহের সংশ্রবে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনে উদার ভাবধারার জন্ম নেয়।

গ) কাবুলে অবস্থানকালে আকবর সুফীবাদের সংস্পর্শে আসেন। তাছাড়া তিনি মরমী কবি হাফিজ ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহশিক্ষক প্রখর যুক্তিবাদী ও সংকীর্ণতামূক্ত মীর আব্দুল লতিফের (কারো কারো মতে তিনি সুন্নি ছিলেন) সান্নিধ্যে এসে সুফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর মাতা হামিদা বানু বেগম ছিলেন পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত কবি ও মনীষীর কন্যা। তিনি উন্নত সংস্কৃতিমনা ও আলোকিত নারী ছিলেন। ফলে মাতা ও শিক্ষকের প্রভাবে বালক আকবরের মনে সুফি ও মরমীবাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্ম নেয়। পদব্রজে আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর মাজার জিয়ারত, বিভিন্ন পির-মাশায়েখ এর সান্নিধ্য গ্রহণ, চিশতিয়াপন্থী সুফি-সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, বিশেষত সুফি-সাধক শেখ সেলিম চিশতির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন এবং তাঁর নামানুসারে প্রথম পুত্রের নামকরণ ইত্যাদি আকবরকে সুফি প্রভাবাধীন মানসিকতার পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে (Ali M, 1969:215)।

ঘ) ষোড়শ শতাব্দী ছিল ধর্মান্ধতার পরিবর্তে আত্ম-জিজ্ঞাসার যুগ, ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা ও অনুসন্ধানের যুগ, বিশ্বজনীন অনুসন্ধিৎসু ও সংশয়ের যুগ। রেনেসাঁ ও জার্মানির মার্টিন লুথার কিং এর ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ইঙ্গ-স্পেন আর্মাডার যুদ্ধ, জৈনপুরের সৈয়দ মুহাম্মদের নেতৃত্বে মাহাদী আন্দোলন, আফগানিস্তানের রৌশনিয়া ধর্মীয় আন্দোলন, সমসাময়িক ভারতবর্ষে ভক্তি-ধর্ম ও একেশ্বরবাদী আন্দোলনের প্রচারক কবির, নানক, চৈতন্য, রামানন্দ,বল্লভাচার্য, নামদেব প্রমুখ মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন জাগ্রতকরণ ইত্যাদির আকর্ষণে আকবর ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সকল সম্প্রদায়কে সম্প্রীতির বন্ধনে একীভূত করার প্রয়াস চালান। কেননা আকবরের মতো প্রতিভাবান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সম্রাটের উপর এই সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। প্রাদেশিক স্তরের শাসকগণ এই সমন্বয়বাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সম্রাট আকবরের আগে আর কোনো মধ্যযুগীয় শাসক কেন্দ্রীয় স্তরে ধর্ম সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

চ) মোগল সাম্রাজ্যের একনিষ্ঠ সেবক আকবরের অভিভাবক বৈরাম খান, আকবরের বন্ধু ও সভাসদ আবুল ফজল, তাঁর পিতা মানবতাবাদী পণ্ডিত শেখ মোবারক, ভাই কবি ফৈজি প্রমুখের সান্নিধ্য আকবরকে ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার তালিম দেয়। এঁরা সবাই সেই সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত, ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সুন্নি মতাদর্শের প্রতি তাঁদের সমালোচনাগুলো আকবরকে জিজ্ঞাসিত করে তোলে। আকবর রাজকার্যে ব্যস্ত থাকলেও মনের একান্তে ধর্ম নিয়ে নিরন্তর চিন্তা ও গবেষণা করতেন। মাহাদী, রাসনী, শিয়া, সুন্নি, হানাফী, সাফেয়ী, মালেকি, হাম্বলী, বোহড়া, খোঁজা, সুফি প্রভৃতি মতাদর্শের মতবিরোধ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের সাথে ইসলামের বিভেদ তাঁকে চিন্তান্বিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে R C Majumdar, H C Ray

Chowdhury I Kalikinkar Datta বলেন “But there is no doubt that he had a yearning after truth and often "tempests of feeling had broken over Akbar's soul" (Majaumdar, 1967:451)।

এই প্রসঙ্গে আকবরের কঠোর সমালোচক বদায়ূণী স্বীকার করেন যে, সম্রাট আকবর প্রতিদিন প্রত্যুষে ফতেপুর সিক্রির একটি পুরাতন ভবনের সামনে সমতল একটি পাথরের উপর তাঁর বুকের উপর মাথা নিচু করে নির্জনে একান্তে বসে প্রার্থনা ও সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করতেন। তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার সত্য উদঘাটনে কৌতুহলী করে তোলে। R C Majumdar বলেন "To the evolution of a new religion, which would, he hoped, prove to be a synthesis of all the warring creeds and capable of uniting the discordant elements of his vast empire is one harmonious whole"(Majaumdar, 1967:451)।

ছ) আকবরের ধর্ম বিষয়ক চিন্তার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতটুকু ছিল তা বাস্তবিক অর্থেই বিতর্কের বিষয় হলেও আকবরের ধর্মচিন্তা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অনুষঙ্গ ছিল, এ কথা অনেকটা জোড়ের সাথে বলা যায়। তবে It might be that Akbar's political aim of establishing and all-Indian Mughal Empire had some influence on his religion policy, as political factors largely influenced the religions settlement of his English contemporary, Queen Elizabeth (Majaumdar, 1967:451)। তদুপরি সম্রাট কেন্দ্রীভূত ভারত ধারণা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি স্থায়ী মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে ধর্মীয় গোঁড়ামী পরিহার করে সকল জনগোষ্ঠীকে একটি একতাবদ্ধ কাঠামোতে আনার চেষ্টা করেন। যাতে করে বিবাদমান দু'জাতির মধ্যে ঐক্য বিধান সম্ভবপর হয় (Prasad, 1958:289). তবে এ সব উপাদান তাঁর মতামত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করলেও এ বিষয়ে R S Sharma বলেন Many of this factors, if they tended to create a liberal atmosphere, were themselves in their turn created by Akbar's natural liberalism and political farsightedness (Sharma, 1963:36)।

এসব বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতবর্গও মধ্যযুগীয় ইতিহাসবেত্তাদের অনুসরণে আকবরের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনাকে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিকায় উপস্থাপন না করে ঐতিহাসিক ভাববাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বেশি মাত্রায় জোর আরোপ করেছেন। ব্যক্তির মননশীলতা গঠনে যুগ-পরিবেশ একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই যুগ-পরিবেশকে মননশীল পরিবেশের সাথে একীভূত করে চিন্তা করেছেন। বাস্তবতা হলো যুগটি ছিল ভক্তি আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। আর এ ধরনের প্রেম-ধর্মের উৎফুল্লতা কিংবা মননশীল পরিবেশের অগ্রসরতা কখনো আকস্মিক স্বতঃস্ফূর্ততা কিংবা ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিফলন হিসেবে উপস্থাপন না করে বরং যুগের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে তার মূল উৎস অনুসন্ধান করাই অনেক শ্রেয়তর পদ্ধতি হিসেবে ধরে নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এ ধরনের ভাববাদী চিন্তা-পদ্ধতি গ্রহণ করে অনায়াসে বলা সহজতর হয় যে, মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলের প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আকবরের চিন্তাধারা বিকাশক্রমের এক আদর্শিক ফলশ্রুতি। তবে মুসলিম ভারতের বিকাশধারা পর্যালোচনায় এরূপ ভাববাদী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলে তৎকালীন সমাজের চালিকাশক্তি ও তার গতিপ্রকৃতি দৃশ্যমান হয় না বলেই যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভ্রান্তির বেড়াজালে মধ্যে থেকে অবমূল্যায়িত হবার সম্ভাবনা বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক বিভাজন ও বিকাশক্রমে সামন্তবাদ নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। ভারতীয় সামন্তবাদের একনিষ্ঠ বিশ্লেষক ড. শর্মা পুঁজিবাদী বুর্জুয়া লেখকদের ছায়া অনুসরণ করে উল্লেখ করেন যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষ

বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামন্তশ্রেণীর বিকাশ ও অগ্রগতি অনেকটা প্রতিহত হয়েছিল (Sharma, 1955:39)। তাঁর এই বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা রয়েছে। কেননা আরব, আফগান, তুর্কি, মোগল কেউই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করেননি বা করতে পারেননি। কেননা, পূর্ব প্রচলিত গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির প্রবহমানতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ কাঠামো অবিকল ধারায় বিরাজমান ছিল। সুলতানি আমলে প্রবর্তিত স্থানীয় পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি, সরল মুদ্রা অর্থনীতির প্রবাহ, নগর জীবন পরিচালনা এবং ভারতবর্ষে বিদেশি বাণিজ্যের পুনঃপ্রবর্তন প্রভৃতি সূচকে এদেশীয় সমাজ কাঠামোগুলোতে তেমন কোন ক্রিয়াশীলতা তৈরি করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে এদেশের বণিক সমাজও কৃষক শ্রেণীর মত আলাদা স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে বিকশিত না হয়ে বিদেশি বাণিজ্য-পুঁজি নির্ভর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিল (Kosambi, 1975:395)।

তবে প্রাক-মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও শাসক-সামন্ত দ্বন্দ্বের অভিঘাতে একটি নতুন সংকটের জন্ম নেয়। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে মুসলিম শাসকগণ ভারতে একটি নতুন শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুসলমান শাসকগণ এদেশে পুরাতন ধারা কিছুটা বিলুপ্ত করে নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র নতুন আঙ্গিকে বিকশিত হতে থাকে। একই সাথে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন দীর্ঘায়িত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। যেমন আলাউদ্দিন খিলজী একজন স্বৈরশাসক ছিলেন, তা সর্বসম্মতভাবে বলা চলে। কিন্তু তাঁর স্বৈরাচারী শাসন ছিল উদীয়মান তরুণ খিলজি অভিজাত ও দেশীয় প্রথাগত সামন্তগোষ্টির অনুকূলে। সেই জন্য তাঁর স্বৈরাচারী শাসনও ভারতীয় প্রেক্ষিতে সফলকাম হয়েছিল (Nigam, 1929:33)। এরই ধারাবাহিকতায় যেসব ঐতিহাসিক ও সমাজ বিশারদ ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির তৎপরতায় নিমগ্ন, তাঁরা মনে করেন ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের ইতিহাস কেবলই হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের ইতিহাস বৈ কিছুই নয় (Qureshi, 1962)। এ ধারার বিপরীতে যাঁরা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, তাঁরা লক্ষ করেন, আকবরের ধর্মনীতি মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় উদ্যোগ ছিল। একই সাথে জাতীয়তা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে বিবাদমান হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐকতান সৃষ্টিতে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচ্য। এর পাশাপাশি তাঁরা আকবরের ধর্মনীতিতে মোল্লাতন্ত্রের পতনও প্রত্যক্ষ করেছেন। এর পিছনে সম্ভবত ইউরোপের রাষ্ট্র-বনাম গির্জার মধ্যকার আধিপত্যবাদ কিংবা স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হবার আশঙ্কা বেশি মাত্রায় চিত্রিত করা যেতে পারে। কেননা ভারতীয় সমাজ এইরূপ দ্বন্দ্বের জন্য কখনো পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। ইউরোপের পোপতন্ত্রের মত ভারতীয় মোল্লাতন্ত্র কোনো সময়েই স্বকীয় শক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হতে পারেনি। ভারতীয় আলিম সমাজও সর্বদা মুসলিম অভিজাতশ্রেণির সহায়ক ও অনেক ক্ষেত্রে অনুগত শক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন মাত্র। এই প্রসঙ্গে কে এম আশরাফের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, মুসলিম শাসকশ্রেণী সাধারণভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেননি, তবে শ্রেণীগত কায়েমি-স্বার্থে কৌশল হিসেবে কখনো কখনো শাসকগণ ধর্মের ব্যবহার করেছিলেন (Ashraf, 1935:112-120)।

ভারতবর্ষে ষোড়শ শতকের প্রেক্ষাপটে আকবরের মননশীল প্রবণতাকে তাঁর উদার ধর্মীয় নীতি নির্ধারণকারী উপাদান হিসেবে চিহ্নিতকরণের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত উপাদান পাওয়া খুবই দুষ্কর। কেননা সর্বপ্রথম ১৫৬২-৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর থেকে দুটো নিপীড়নমূলক কর জিজিয়া ও তীর্থকর বিলোপ এবং যুদ্ধবন্দিদের ক্রীতদাস বানিয়ে ইসলামের দীক্ষিত করার পূর্বতন প্রথা নিষিদ্ধ করে সম্রাট আকবর তৎকালীন ধর্মীয় খোলস থেকে তাঁর উদারনীতির অবস্থানকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। অথচ তখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে গতানুগতিক হানাফি-সুন্নি

মতধারার একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। সুফিবাদ ও সুলহ্-ই-কুল নীতিতে তখনো তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেননি। এমনকি সেই সময় অতি রক্ষণশীল আলিম মাখদুমুল মুলক ও আব্দুন্নবী প্রমুখের তীব্র প্রভাব ছিল রাজদরবারে। তাঁদের প্রতাপের কারণে শায়েখ আব্দুন্নবীকে সদর-উস-সুদূর পদে নিয়োগ দিতে আকবর অনেকটা বাধ্যও হয়েছিলেন। কাজেই সাধারণত আকবরের উদারনীতি আর যাই হোক কোনো Intellectual conviction- এর প্রতিফলন নয়। উল্লেখিত কারণে আকবরের ধর্মনীতির মূল উৎস তাঁর যুগের Intellectual environment অথবা তার উদার মানসিক প্রবণতা অর্থাৎ তাঁর স্বাভাবিক মঙ্গল চেষ্টার মধ্যে অনুসন্ধান না করে বরং তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থার মধ্যে অনুসন্ধান করতে পারলে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৬১)।

দ্বাদশ শতকের শেষ প্রান্ত থেকে উদীয়মান তুর্কো-মুসলিম শক্তি উত্তর ভারতের পতনশীল সামন্ত শক্তির প্রভাবশালী প্রতিনিধি রাজপুতদের পরাস্ত করে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও শক্তিশালী রাজপুত জাতিকে নির্মূল করা একেবারেই সম্ভবপর হয়নি। আরব-পারস্য ও আফ্রিকায় মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে সেখানকার স্থানীয় শক্তিকে পরাভূত করে আরবিকরণ তথা ইসলামিকরণ সম্ভবপর হলেও ভারতীয় সমাজে তা ছিল অনেকটাই অসম্ভব। যে কারণে দেশীয় ক্ষমতাচ্যুত শক্তির সাথে বহিরাগত মুসলিম সামন্তশক্তির সংঘাত চলমান থেকে যায়। যা দোয়াব অঞ্চলে নিয়মিত বিদ্রোহের রূপ নেয়। যদিও এগুলোকে কৃষক বা গণবিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল (Majumdar, 1969:40)। এছাড়াও ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পাবার পর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জাতিসত্তা ও গোত্রীয় অভিজাতবর্গের সমাবেশ ঘটতে থাকে এবং একই সাথে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। সুলতানি আমলের মুসলিম অভিজাত শ্রেণির প্রকাশ ও বিকাশ গভীর নিরীক্ষণে এ দ্বন্দ্বের গতিপ্রকৃতি ও বাস্তবতা অনুধাবন করা সহজতর হয়ে উঠে (Nigam, 1929:40)। বস্তুত দিল্লি সালতানাতের বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতনের পেছনে অভিজাত সামন্তদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের অনেকে আবার এই উত্থান পতনকে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথা সত্য যে এদেশে মুসলিম শাসনের গোঁড়া থেকে স্বদেশী ও বিদেশী নবাগত অভিজাতবর্গের মধ্যকার স্বার্থ-সমন্বয়করণের বিষয়টিতে মৌলিক যে সমস্যাটি ছিল তার সুরাহা হয়নি কখনো। মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তি কাঠামোর তৎপরতায় এবং ক্ষমতা বদলের কারণে উত্তেজনা সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি হতো মাত্র। ফলে ইলবারী, খিলজি, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী অর্থাৎ সবক'টি শাসক বংশের উত্থান-পতনে অভিজাতশ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এমনটি লোদী বংশের স্থায়ীত্বের জন্য বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংস্কার ও মোগল বিরোধী প্রতিরোধে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন (Siddiqui, 1969:98)।

সম্রাট আকবর উল্লেখিত পটভূমিতে প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন হন। কারণ তিনি এই সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। ১৫৬২ সালের পর প্রায় দশ বছর ধরে অনেকাংশে ভারতীয় হয়ে উঠা উজবেক, আফগান, তুর্কি শক্তির ক্ষমতা বিনষ্ট করতে তিনি জোর প্রচেষ্টা চালান। তাঁর ভাই মির্জা হাকিমও এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এহেন বাস্তবতায় আকবরের রাষ্ট্রীয় সাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। তিনি অন্তঃকরণ দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি না থাকলে তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। তাই তিনি সংকট উত্তরণে ভারতীয় সুন্নি-মুসলিম, খোরাসানী ও রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা অর্জনকে দৃঢ় লক্ষ হিসেবে স্থির করেন। ভারতে বসবাসরত অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন সুন্নি। তাঁদের সমর্থন আদায়ের জন্য শিয়া ও ভিন্নমতাবলম্বী ছোট ছোট মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংস্কারপন্থী মাহাদভীদের ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিয়াদের প্রতি তার বিরূপ আচরণের মাধ্যমে, একই সাথে মোগল সাম্রাজ্যকে ইরানি প্রভাবমুক্তির ব্যবস্থা করেন। মুসলিম শাসন

বিরোধী রাজপুত শক্তির আস্থা অর্জনের জন্য পূর্বতন দাসপ্রথা, জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্যকরণসহ তীর্থ ও জিজিয়া কর এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তাঁর হিন্দু ধর্মাবলম্বী পত্নীগণসহ মোগল শাসনাধীনে সর্বত্র সব ধর্মের প্রজাসাধারণের জন্য নিজ নিজ ধর্ম পালনে অবাধ স্বাধীনতার বন্দোবস্ত করেন। এমনকি নতুন বিজিত অঞ্চলসমূহে কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো গোষ্ঠী দ্বারা যেন কলুষিত কিংবা বিধ্বস্ত না হয় সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাঁর গৃহীত নীতিসমূহ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। তাঁর পদক্ষেপসমূহে একদিকে যেমন যুগপথ উদারতা ও ধর্মীয় সমতা-নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, অন্যদিকে তাঁর রাজশক্তির আদর্শ স্বাদেশিকতার ছোঁয়ায় পুষ্ট হয়ে উঠে। এর প্রভাবও ছিল সাম্রাজ্যব্যাপী। একদিকে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিঘোষিত নীতি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। অন্যদিকে রাজপুতদের সামন্ত স্বার্থে আঘাত না হেনে বরং তাঁদের স্বার্থের পরিপুষ্টতা সাধনের মাধ্যমে তাঁদেরকে রাজকীয় অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির পাকাপাকি ব্যবস্থা করে আকবর তাঁদের আস্থাভাজন সামন্ত প্রভু হবার যোগ্যতা অর্জন করেন (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৬৫)। সুতরাং এইসব পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে আকবরের রাষ্ট্রীয় সমন্বয় সাধনা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করলে তাঁর ধর্মীয়-নীতির মূল উৎস ও উদ্দেশ্য অনুধাবন সম্ভব ও সহজতর হয়।

সুলতানি শাসনের বিলুপ্তির পর মোগল শক্তির উত্থান, এর মাঝপথে সুরি বংশের আগমন, অতঃপর আবার মোগলদের আধিপত্য ইত্যাদি বাস্তবতায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভারতীয়করণের প্রবণতাকে অধিকতর বিকাশ সাধন করে দেশীয় শক্তিসমূহের মধ্যে সাজুয্য বিধান করাই সমকালীন দাবি হিসেবে উত্থিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে আকবর তাঁর সময়কালীন সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ত শ্রেণীর সচেতন ও প্রগতিশীল অংশের যোগ্য অভিভাবক হিসেবে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন। রাষ্ট্রীয় শক্তি কাঠামোতে ভারতীয়করণ জোরদার করতে গিয়ে সমকালীন সাংস্কৃতিক জগতের তোলপাড় স্বাভাবিকভাবেই আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এজন্য তিনি ধর্ম-সমন্বয় নীতি রাষ্ট্রীয় সাধনার পরিপূরক একটি আদর্শগত কাঠামোতে প্রতিস্থাপনের তাগিদ অনুভব করেন। শুরু হয় প্রচলিত ও বিবাদমান ধর্মগুলোর ভিতরকার নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য তালাশে তাঁর আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমা। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে ধর্মগুলোর গভীরে প্রবেশ করার স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃতকরণ এবং চলমান ধর্মীয় সংঘাত অতিক্রম করে নব-বিধানের স্বপ্ন নিয়ে তিনি ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে "ইবাদতখানা" (House of Worship) নামে একটি ধর্মসভাগৃহ নির্মাণ করে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। আবুল ফজল এই ইবাদত খানাকে পণ্ডিতদের অভ্যথনাগৃহ বলে অভিহিত করেছেন (আবুল ফজল, ২০০৮:৪১)। প্রতি শুক্রবার রাতে এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দিবসের রাতে সম্রাট স্বয়ং ইবাদতখানায় উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় পন্ডিতদের সাথে রাতভর ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। পণ্ডিতেরা যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কারপ্রাপ্ত হতেন (আবুল ফজল, ২০০৮:৪১)। তিনি মনে করতেন ইবাদতখানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয় বিভেদ দূরীকরণে একটি প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে। শুরুতে তিনি সুন্নি মতাবলম্বী ওলামাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে ইসলামের সর্বজনীন সৌন্দর্য তুলে ধরে পর্যালোচনামূলক স্বাধীন মত প্রকাশের অনুরোধ জানান। রক্ষণশীল সুন্নি আলিমদের মধ্যে শেখ আব্দুল নবী, শেখ তাজউদ্দীন, শেখ মাখদুমুল মুলক, শেখ আবুল ফতেহ, শেখ নকিব খান এবং উদারপন্থী ও সুফি মতের অনুসারী শেখ মোবারক, শেখ ফৈজি ও শেখ আবুল ফজল বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করেন। রক্ষণশীলরা আলোচনার মধ্যে একে অপরের কুৎসা রটনা ও পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে অপতৎপরতা চালান। ফলে শিয়া-সুন্নি বিরোধ প্রশমিত না হয়ে চরম আকারে পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে R C Majumdar বলেন "There discussions soon took the shape of "vulgar rancour,

Morbid orthodoxy and personal attacks"and they could not reply to some of the queries of Akbar to his satisfaction” (Majumdar, 1967:451)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাল্যকাল থেকেই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন উপদলগুলোর মধ্যকার কোন্দল, ধর্মদ্বন্দ্ব, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, ধর্মবিশারদদের ধর্মান্ধতা ইত্যাদি তাঁকে গভীরভাবে আহত করতো। অতঃপর ইবাদতখানার বিতর্ক, ধর্ম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ও সংকীর্ণতা প্রদর্শন আকবরকে আরো বেশি ভাবিয়ে তোলে। আকবর যেহেতু একজন গভীর ধর্মপরায়ণ, উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ত্ব ছিলেন, তাই তিনি সত্যতানুসন্ধানের লক্ষ্যে সর্ব-ধর্ম সারগ্রাহী হয়ে ব্রাহ্মণ, জৈন, খ্রিস্টান, জরথুষ্ট্র, পারসিয়ান প্রভৃতি ধর্মের মূল বক্তব্য, মূলসার ও মূলমন্ত্র জানার আকুল আগ্রহ নিয়ে স্ব-স্ব ধর্মবিশারদদের আমন্ত্রণ জানান। প্রকৃত সত্য কি? তা আগ্রহ সহকারে প্রশ্নের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানার চেষ্টা করে প্রত্যেক ধর্মের প্রতি তিনি সমান শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রদর্শন করতেন। তবে সব ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন জনগণের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমনকি খ্রিস্টান পাদ্রী রিডেলফু ও মনসারেট মনে করে বসেন যে, আকবর তাঁদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে শীঘ্রই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। জৈন সাধুপণ্ডিত হরি বিজয় সুরী যে স্মরণীয় অভ্যর্থনা পান তা ১২২০ সালে আকবরের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিস খান কর্তৃক চীনা তাও মতাবলম্বী সাধু 'চাং চুন' এর সম্বর্ধনার সাথে তুলনীয়। আলোচনারত বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের মধ্যকার বাচন-বচনযুদ্ধ সত্ত্বেও আকবর পরম শ্রদ্ধাভরে সবার বক্তব্য শ্রবণ করতেন। যা স্বাভাবিক অর্থেই সে যুগের প্রেক্ষাপটে একটি সমাজ বিপ্লবের সমতুল্য।

আকবর আশা করেছিলেন ইবাদতখানার ধর্মসভায় ধর্মবেত্তাদের আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার ফলে সব ধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য সাধারণ সূত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্নতর। ধর্ম প্রবক্তাগণ পরস্পরের ধর্মমত, এমনকি নিজ ধর্মের বিভিন্ন দল-উপদলসমূহের মতামতকে আক্রমণ করে সমানতালে উগ্রভাষা ব্যবহার করছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ অন্যান্য হিন্দু জনগোষ্ঠীকে নিচু জাত মনে করে পূজা-পার্বণে মন্ত্র পাঠে এবং বিভিন্ন সামাজিকতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে সক্রিয় ছিলেন। এমনকি হরিজনসহ অনেককে অচ্ছুত মনে করতেন। খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টেন্ট দুই দলের মধ্যে মতভেদ এতই প্রকট ছিল যে, খ্রিস্টান হয়েও পরস্পরকে পুড়িয়ে হত্যা করা পুণ্যকাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। বিশ্বে প্রচলিত সব ধর্মের মধ্যে পরধর্ম-সহিষ্ণুতা অনেক বেশি ছিল একমাত্র ইসলাম ধর্মে। কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মমত একেবারেই ভ্রান্ত ও অপালনযোগ্য। ইসলামে এই বিশ্বাস ছিল চূড়ান্ত এবং অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে উদারতা প্রদর্শন ও সশ্রদ্ধ আলোচনা করা একেবারে অচিন্তনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য। সার্বিক বিবেচনায় সম্রাট আকবর পর্যবেক্ষণ করেন যে, এসবের ফলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বেড়ে গিয়ে প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। তাই ইবাদতখানায় আনুষ্ঠানিক বিতর্ক-আলোচনা বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে তাঁর একান্ত অনুসন্ধান বন্ধ না করে চলমান রেখে দেন। সকল ধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলো পণ্ডিতদের দ্বারা ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে শোনার ব্যবস্থা করেন। ফলে প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পর্কে তিনি প্রকৃত ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। আবুল ফজল ও বদায়ুনির বক্তব্যে এ সম্পর্কিত সবিস্তার ধারণা পাওয়া যায় (Badauni, 1898:517-519; Bakshi, 90-91; Fazal, 1907:59-60)। সম্রাট আকবর সব ধর্মের আলোচনা শুনে শেষ পর্যন্ত এই মর্মে চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হন যে, প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক বিষয় তথা মূলনীতিগুলো মোটামুটি এক ও অভিন্ন। যদিও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আলাদা ঢঙ্গ-এ উপস্থাপিত এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙ-এ পালিত হয়। সুতরাং ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যদি গোঁড়ামিকে পরিহার করা যায় এবং আনুষ্ঠানিক ভিন্নতা দূর করা যায় তাহলে সকল ধর্ম সমন্বয় করা সম্ভবপর হতে পারে। অতএব আকবর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে তাঁর ধর্মনীতির মূল কথা পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা সুলহ্-ই-কুল নীতি গ্রহণ করে একেশ্বরবাদের উপর পূর্ণ আস্থা

জ্ঞাপণ করেন। সুফি আব্দুল লতিফ ও ইমাম আল-গাজ্জালীর মরমী দর্শন এক্ষেত্রে সম্রাটকে প্রভাবিত করেছিল বলে ধারণা করা হয়। তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা ছিল সত্যের অনুসন্ধান, প্রকৃত ধর্মের মূলনীতি সংগ্রহ ও প্রচার করা। পাশাপাশি এর ঐশ্বরিক উৎস খুঁজে পাওয়া।

আকবরের কর্মকাণ্ড দেখে অনেকে মনে করতে থাকেন যে, হিন্দু দর্শনের প্রভাবে আকবর সম্ভবত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে শুরু করেন। জৈন ধর্মগুরু হিরা বিজয় শুরির প্রভাবে সম্রাট ক্রমে অহিংস নীতির প্রতি অনুরাগী হন এবং সম্ভবত তিনি পশু শিকার, হত্যা ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সম্রাট নিজেই নিরামিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হন। তাঁর সভাসদদেরকেও আমিষ ভোজনের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে থাকেন। জরথুষ্ট্র পণ্ডিত দস্তুর মেহেইরজী এবং পারসিক প্রভাবে সম্রাট সূর্য ও অগ্নির উপাসনা শুরু করেন। এমনকি রাজ দরবারে যাতে পবিত্র অগ্নি সর্বক্ষণ প্রজ্জলিত থাকে, আবুল ফজলকে সম্রাট এহেন নির্দেশ দিয়েছেন বলে একটি গুজব প্রচলিত ছিল। এছাড়াও রাজকীয় অনুগ্রহের চিহ্ন হিসেবে মেহেইরজীকে ২০০ বিঘা জমি প্রদান করা হয়। খ্রিস্টান ফাদাররা সম্রাটের উদারতার সুযোগে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও পবিত্র কোরআনের অবমাননা করতে থাকেন। ঈশ্বরী প্রসাদ এই বিষয়টিকে সম্রাটের উদার প্রশ্রয়ের অপব্যবহার হিসেবে গণ্য করেছেন (Prasad, 1958:295)। সম্রাট আকবর শিখ গুরুদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলেন। শিখ গুরুর অনুরোধে পাঞ্জাবের রায়টদের সুবিধার্থে এক বছরের রাজস্ব মওকুফ করে দিয়েছিলেন। শিখ ধর্মগ্রন্থ "গ্রন্থ সাহেব"র প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন (Prasad, 1958:295)। অতএব বিভিন্ন ধর্মের সাহচর্যে এসে আকবর অনুধাবন করেন যে, ভারতবর্ষের মতো যে দেশে বহু ধর্মের, বহু জাতের, বহু গোত্রের, বহু সংস্কৃতির সহাবস্থান, সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমষ্টি জীবন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদের কারণে সখ্য ও সম্প্রীতির বদলে পারস্পরিক দূরত্ব ও বৈরিতার কালো ছায়ায় নিমজ্জিত হোক, এ ধরনের সংকট থেকে মুক্তির উপায় বের করা অত্যন্ত জরুরি। অতঃপর তিনি একটি সমন্বিত ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে সকল ধর্মমত ও পথকে একসূত্রে আবদ্ধ করার প্রয়াস চালান।

আকবর তাঁর ধর্মীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ রূপ বাস্তবায়নে একটি আদর্শগত ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁর আধ্যাত্মিক পদযাত্রা আরম্ভ করেন। তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থসমূহ এবং ধর্মীয় আচারাদির গভীরে মনোনিবেশ করার স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত করতে ইবাদতখানা নির্মাণ ও বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। কিন্তু তিনি এতে কোনো সুফল লক্ষ করেননি। বরং ধর্ম বিশারদদের স্ব-স্বার্থ কেন্দ্রিক পারস্পরিক বিদ্বেষ ও মতবিরোধ এবং ধর্ম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ইত্যাদি কারণে ধর্মীয় জটিলতার নিরসন ও নতুন সমাজ গঠনে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ধর্ম নেতাদের অনুপযুক্ত মনে করে তাঁদের একক আধিপত্য খর্ব করার মানসে ১৫৭৯ সালের জুন মাসে এতদ্বিষয়ে বিখ্যাত "মহজরনামা" নামে একটি ডিক্রি বা ঘোষণাপত্র জারি করেন, উক্ত বিষয়ে *মুন্তাখাব-আত-তাওয়ারিখ* ও *তবকাত-ই-আকবরি* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। সভাকবি ফৈজি এই খুৎবা বা ঘোষণাপত্র রচনা করেন। সম্রাট ফতেপুর সিক্রির মসজিদে নিজ নামে খুৎবা পাঠের মাধ্যমে বিষয়টি ঘোষণা করেন। ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য হলো- ইসলাম ধর্মের কোন ব্যাখ্যা নিয়ে ওলেমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে 'পাদশাহ' চূড়ান্ত রায় প্রদান করবেন। এই ঘোষণা দ্বারা সম্রাট নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করলেন। ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে রোমের পোপের অনুজ্ঞা যেমন অভ্রান্ত ও অবশ্যই পালনীয়, ঠিক তেমনি ভাবে ধর্ম বিষয়ে আকবরও 'পাদশাহ'র সার্বভৌম কর্তৃত্ব ঘোষণা করেছিলেন। পোপ নিজেদেরকে ঈশ্বরের পার্থিব প্রতিনিধি বিবেচনা করে যে অভ্রান্ত কর্তৃত্ব দাবি করতেন, আকবরের চিন্তা-চেতনায় হয়তো সেই আভাস দেখা দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সামন্ত সমাজ-জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে বর্তমান যুগোপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্রাট অষ্টম হেনরি ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা

খর্ব করে নিজেকে Supreme head of the church বা act of supremacy ঘোষণা করেছিলেন। আকবরের সমসাময়িক রাণী এলিজাবেথও দু'দলের অনেক সংঘাতের পর Supreme governor of the Church হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাইনদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে একটি সার্বজনীন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপে যেমন পোপের দাবি অস্বীকার না করলে সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও মুসলিম বাদশার জন্য বিশ্ব শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে ইরানের শাহ্ এবং ওসমানি তুর্কি সালতানাত তথা বিশ্ব সুন্নি সম্প্রদায়ের খলিফা বলে তুর্কি খেলাফতের সার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা একান্ত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল। আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগীয় সামন্ত সুলভ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ওলামা সমাজের দাবি ছিল যে, "মুসলিম মিল্লাত" বা সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকট বাদশাকেও জবাবদিহি বা নতি স্বীকার করতে হবে। আকবর এইসব স্বার্থান্বেষী চিন্তা ও ধারাকে বিলুপ্ত করার মানস নিয়ে আধুনিক ও যুগোপযোগী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনে অগ্রণী হয়ে মহজরনামা বা অভ্রান্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিজেই ইমাম-ই-আদিল বা প্রধান ইমাম খেতাবে ভূষিত হন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে ফতেপুর সিক্রির প্রধান ইমামকে অপসারণ করে ইহ ও পারলৌকিক সামগ্রিক বিষয়ে তিনি ধর্মীয় গুরুর পদমর্যাদার অধিকারী হন।

আই এইচ কোরেশি, অধ্যাপক জন রিচার্ডস, ভিনসেন্ট স্মিথ ও বদায়ূনিসহ অনেকে মহজরনামা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আধুনিক ঐতিহাসিকগনও আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কিত চেতনা বিকাশের ভিতরকার উৎসব নিয়ে কোনো মৌলিক অনুসন্ধান চালাননি। অথচ তাঁরা সম্রাটের ধর্ম-নীতির খোলস উন্মোচনে অধিকতর আগ্রহী হয়েছিলেন। ভিনসেন্ট স্মিথ তো আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যও করেছেন। তিনি বলেন- The divine faith was a monument of Akbar fully, not of his wisdom (Smith, 1917:222)। এছাড়াও বদায়ূনি ও যেসুইট ফাদারদের অনুসরণ করে স্মিথ আরো বলেন, আকবর ধর্মমতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নিজ দায়িত্বে তুলে নিয়ে একাধারে পোপ ও সিজারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যা ছিল অনেকটা হাস্যকর প্রয়াস। এর জন্য তিনি মহজরনামাকে Infiliability Decree (Smith, 1917:223) বা অভ্রান্ত সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মুসা আনসারী বলেন- আকবর সম্পর্কে তাঁর (স্মিথ) এরূপ বিরূপ মূল্যায়নের কারণ সহজেই অনুমেয়। তিনি উপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতের স্টিল ফ্রেমের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক, তদুপরি Moribund Capitalism যুগের পাশ্চাত্য বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, এদেশের মহিমাকে ক্ষুদ্রভাবে দেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৫৮)। আই এইচ কোরেশির মতে- আকবর মহরজনামা প্রকাশ করে ভারতীয় মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত করেছেন এবং আলিম সমাজও এর ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এই অভিমতে কিছুটা সত্যতা হয়তো রয়েছে। কেননা রক্ষণশীলতার বিলুপ্তি ও ক্ষমতা হ্রাস হবার আশঙ্কায় অনেক আলিম সম্রাটের ঘোষণায় সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন। তবে মুসলিম সমাজের অসন্তুষ্টির প্রচারণায় অনেক অতিরঞ্জন ছিল বলে মনে হয়। কেননা দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিত (আহলে কলম) ও অভিজাত শ্রেণীর (আহলে তেগ) এক সভায় বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষরে এই মহজরনামা গৃহীত হয়েছিল। তদুপরি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে আকবরের পক্ষে রাজত্ব করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। মোগল শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলার মত অদূরদর্শী শাসকও তিনি ছিলেন না। বস্তুত আকবরের ধর্মীয় নীতি সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে না দেখার ফলে কোরাইশির মূল্যায়নও একপেশে হয়েছে (মুসা আনসারী, ১৯৯২:৬৬)। সব দিক বিবেচনায় রেখে বলা যায় মহজরনামা নিঃসন্দেহে ভারতীয় স্বাদেশিকতার একটি উল্লেখযোগ্য পরিচয় তুলে ধরেছিল।

মহজরনামা জারি করার কিছুদিনের মধ্যে ১৫৮০ সালেই আকবর তাঁর ধর্মবিষয়ক পরিকল্পনার মূল বক্তব্য "সুলহ্-ই-কুল" বা পরধর্ম সহিষ্ণুতানীতি জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে প্রজাবর্গের প্রতি তাঁর উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব ঘোষণা করা (Fazal, 1907:400)। একই সাথে ভারতবর্ষে অনুকরণীয় জাতীয় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদিও আকবর পূর্ব ভারতবর্ষে জাতীয়তার চেতনা তেমন জোড়ালোভাবে কখনো বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। আকবর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিয়োগ দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ও শের শাহ্ সুরি সীমিত গণ্ডিতে জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু তা সফলকাম হয়নি। আকবর যেভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিভেদ দূর করে ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টায় ধর্মকে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ তেমনটি করেনি। ভারতের খণ্ডিত, ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সুলহ্-ই-কুল নীতি প্রয়োগ করেন। নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ, সব শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে সবার অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়ে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আকবর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে টোডরমল, বীরবলসহ অনেককে নিয়োগ দিয়ে তৎকালীন সামন্ত যুগের প্রচলিত প্রথা অগ্রাহ্য করেন। কথিত আছে আহমদাবাদে এক ঝটিকা অভিযানে সম্রাটের ২৭ জন পার্শ্বচরের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। গুজরাট অভিযানে টোডরমল সম্রাটের সাথে থেকেছেন এবং বঙ্গ বিজয়ের পর বাংলার ভূমি ব্যবস্থা নিরূপনের ভারও দেন টোডরমলকে। মানসিংহও বাংলায় রাজ প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। এছাড়াও কাবুলের মত সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের রাজপ্রতিভূ হিসেবে শাসন করার জন্য মানসিংহ প্রেরিত হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে নেপোলিয়ন যেভাবে প্রতিভা ও সামর্থের ভিত্তিতে রাজকার্য্যে নিয়োগ (career open to talent) নীতি প্রয়োগ করেন, সম্রাট আকবর তার তিনশত বছর পূর্বে এই রীতির সফল বাস্তবায়ন করেছিলেন। আকবরের এ সুলহ্-ই-কুল নীতি ছিল পরমতসহিষ্ণুতার একটি বাস্তব ও প্রয়োগিক দলিল এবং একই সাথে মানবতাবাদী আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ধর্মীয় বিদ্বেষ ও তর্ক-বিতর্কে বিরক্ত হয়ে পরস্পর ধর্ম-বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করবার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর ১৫৮১ মতান্তরে ১৫৮২ সালে তাঁর ধর্ম-সমন্বয় কার্যক্রমের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে "দ্বীন-ই-ইলাহি" নামে নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তন করেন। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল সবধর্মের সারবস্তু একীভূত করে প্রবর্তিত দ্বীন-ই-ইলাহিকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করা। বদায়ূনি একে একেশ্বরবাদী বা তৌহিদ-ই-এলাহি (Devine Monotheism) ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করলেও যেসুইট লেখক ড্যানিয়েল বার্টুলির উদ্ধৃতি দিয়ে স্যার এস এম এ রিজভী এ বিষয়ে বলেন- "It was a new religion, compounded, out of various elements, taken partly from the Koran of Muhammad, party from the scriptures of Brahmans, and to it certain extent, as far as suited his purpose, from the Gospel of Christ" (Rizvi, 1987:68)। এ ধরনের বক্তব্যও অনেকটা পক্ষপাত দুষ্ট বলে মনে করা হয়। কেননা দ্বীন-ই-ইলাহিতে দেব-দেবী, অন্ধবিশ্বাস কিংবা কোন ধর্ম প্রচারকের অস্তিত্ব ছিল না, বরং তা অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন, প্রজাতুষ্টি ও প্রকৃতি অর্চনার এক অজৈব সংমিশ্রণ বলা সমীচীন মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরী প্রাসাদ বলেন "It was an electic phantheism, containing the good points of all religions- a combination of mysticism, philosophy and nature worship. It's basis was relation it upheld no dogma, recognised no Gods or prophets, and the emperor was its chiep exponent" (Prasad, 1958:296)। মূলত সম্রাট আকবর ধর্মপ্রচারক অপেক্ষা ভারতীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচারক হিসেবে সর্ব-ধর্ম-সার নিয়ে

দ্বীনি-ই-ইলাহির মাধ্যমে আকবর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে এক শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর দ্বীন-ই-ইলাহির মূল বৈশিষ্ট্যও ছিল সকল সম্প্রদায়ের বিনা বাধায় এই ধর্ম বা মতবাদে দীক্ষা গ্রহণে সমান সুযোগ প্রদান। যেন মোগল শাসনাধীনে সব ভারতীয় জনগোষ্ঠী সমান তালে সম্রাট ও সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য পোষণ করতে সদা সক্রিয় থাকে। মূলত আকবরের ক্ষমতা গ্রহণের শুরু থেকেই ধর্ম সমন্বয়, অতঃপর নব ধর্ম-মতের অবতারণা প্রভৃতি কার্যক্রমের পিছনে এই অভিপ্রায়টি মূল ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছিল।

সম্রাট আকবরের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যা তাঁর সত্যানুসন্ধানী চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর ভাবপ্রবণ মন সদা সত্যানুসন্ধানে ঐকান্তিকভাবে মগ্ন থাকতো। দ্বীনি-ই- ইলাহি ছিল বিশেষত দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর একটি ধর্মনৈতিক-দার্শনিক মতবাদ। তবে এটি কোন ধর্মীয় অনুশাসন নয় বরং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অনুশাসন ছিল মাত্র। যার মর্ম উপলব্ধিতে সাধারণ মানুষের বোধগম্যতা তেমন একটা কাজ করেনি বলে মনে করা হয়। তদুপরি একটি বিশেষ ধর্মীয় মোড়কে বিশেষ রাজনীতি গ্রহণ করার মত মানসিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিক প্রস্তুতি মধ্যযুগীয় ভারতবাসীর মধ্যে অনেকটা অনুপস্থিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। সম্রাট আকবরও ধর্মীয় নীতির ব্যাপারে এবং দ্বীন-ই-ইলাহি প্রচারে গতানুগতিক পথ ও মত অনুসরণ করেননি। ফলশ্রুতি হল দ্বীন-ই-ইলাহি প্রচার ও প্রসারে ব্যাপকতা লাভে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ধর্ম মতের কারণে সম্রাট আকবর একমাত্র ধর্মীয় সমন্বয় নীতির প্রশ্নে ব্যাপক আলোচিত ও বহুল সমালোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। হাঙ্গেরিয়ান ঐতিহাসিক ইগনাগ গোল্ডজিহার এই প্রসঙ্গে বলেন, "The religion of Akbar is not to be looked upon as reform but a denial of Islam" (Goldzihar, 1917:330)।

মোহাম্মদ ঘুরির ভারত বিজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষে ধারাবাহিক মুসলিম শাসন চলমান থাকলেও সাড়ে তিন'শ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত কোন শতবর্ষি রাজবংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোগলগণ ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজবংশের অধিকর্তায় রূপান্তরিত হন। আকবরও সর্বস্তরের প্রজাসাধারণকে একক রাজনৈতিক সংগঠনের আওতাভুক্ত করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে ভারতীয় ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। এভাবে জাতীয় একতা বিধান করার সমুজ্জল ধারণার জন্য মহামতি আকবর সকল ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সর্বসময়ে শীর্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, থাকবেনও চিরকাল। কিন্তু যে সুলহ্-ই-কুল বা পরধর্ম সহিষ্ণুতার মন্ত্র নিয়ে সব ধর্মের সার-সংকলন হিসেবে দ্বীন-ই-ইলাহি প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই তাঁর মনোভাব অনেকের কাছে তখন এবং পরবর্তী যুগে ইসলাম বিরোধী কিংবা ধর্ম নিয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে একটি ধারণা পুঞ্জীভূত হয়। কেননা রাজনৈতিক সংহতির মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ এবং হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য দূরীভূত করে সকল শ্রেণীতে শান্তি ও প্রীতির বন্ধন ঘটিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংঘ প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ আকবর গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য নতুন করে ধর্মমত প্রবর্তনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। এমনকি এই ধর্মমতের মধ্য দিয়ে জনগণের মাঝে কোন বিভ্রান্তি ছড়ানোরও প্রয়োজন ছিল না। বরং কট্টর মতের ও পথের ধারক বলে আস্ফালনকারী রক্ষণশীল ও গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রকে বাইরে রেখে ইসলামের উদার, সহনশীল ও সার্বজনীন ঔজ্জ্বলতা তুলে ধরে তা ভারতবর্ষের সবধর্মের জনগোষ্ঠীর উপর সমতা বিধান করে যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারলেই সে মহতী উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ পূর্ণাঙ্গরূপে সফলকাম হতে পারত। কিন্তু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে স্ব-ধর্মীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে তাঁর ধর্মীয় মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে বিরূপ তোলপাড় সৃষ্টিতে তিনি নিজেই বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে সব ধর্মের মূলভাব নিয়ে নতুন ধর্মমত প্রচার করে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেননা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ধর্ম মানুষের সৃষ্ট নয়, ধার নিয়ে নতুন ধর্মও সৃষ্টি করা যায় না। আর ধর্ম প্রবর্তকগণ কখনও

ধর্ম তৈরি করেননি, তাঁরা শুধু ধর্ম প্রচার করেছিলেন মাত্র। ফলশ্রুতিতে দ্বীন-ই-ইলাহি ও তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এক পর্যায়ে খাজা শায়খ আহমদ সরহিন্দি নামক এক মুসলিম সাধক আকবরের নব প্রবর্তিত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে এক সফল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। যা ইসলামি পুনর্জাগরণ ও ইসলাম পুনরুদ্ধার আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করে। একই সাথে শায়খ আহমদও "মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ঈ-সানি" বা দ্বিতীয় সহশ্রাব্দের ইসলামিক সংস্কারকের মহান খেতাবে ভূষিত হন।

অবশ্য আকবর প্রথম জীবনে সুফি ঘরনার সুন্নি মুসলমান হিসেবে একনিষ্ঠ ধর্মভীরু লোক ছিলেন। রক্ষণশীল আলেমদের ধর্মীয় গোঁড়ামী দেখে আকবর হতাশ হয়ে পড়েন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নেতাদের সাথে সম্রাটের সম্মানসূচক আচরণ দেখে কট্টরপন্থী ওলেমাগণ সম্রাটের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে উঠে বিদ্বেষবশত তাঁরা সম্রাটকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে সমাজে প্রচার শুরু করে দেন। এতে সম্রাটের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে প্রকৃত অবস্থার চেয়ে অধিক মাত্রায় প্রচার পেয়েছে বলে আবুল ফজল মনে করেন (Prasad, 1958:296)। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মধ্যযুগীয় ভারতে রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে যে ধারা ইসলাম প্রবর্তন করেছিল আকবরই প্রথম তার শ্রেণীগত ও গুণগত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করেন। আকবরের চিন্তা ও মানষ যুগের অনেক অগ্রবর্তী ছিল, যা তৎকালীন আলিম সমাজ অনুধাবন করতে কিংবা তাল মেলাতে অসমর্থ ছিলেন বলেই তাঁরা আকবরকে মুসলিম বিদ্বেষী কিংবা ধর্মত্যাগী আখ্যা দিতে কার্পণ্য করেননি। বাস্তবতা হলো, ইসলামের মৌলিক বিধান- আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি সমআচরণ ও সমমর্যাদা বিধান করা। যা সম্রাট আকবর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে 'মিল্লাত' বা সমগ্র মুসলমান সমাজের বাইরে যে বিপুল অমুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে তিনি রাষ্ট্রে সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। সংখ্যালঘু মুসলমানরা ভারতীয় সমাজে তখন বিদেশী ও বিধর্মী হিসেবে বিবেচ্য। কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় এই বিদেশী ও বিধর্মীদের প্রভাব বাস্তবকিই যথেষ্ট পরিমানে বলবৎ ছিল। আকবর এই চেতনা থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধু ধর্মগত কারণে সংখ্যাগুরু অমুসলিম সমাজকে বিভিন্ন কর প্রদানের মাধ্যমে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা কিংবা রাজকার্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে বরদাস্ত করতে পারেননি। ফলে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে সুনিপুণভাবে মুসলিম শাসন ও সমাজকে দীর্ঘায়িত করার কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই ভারত মানষে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৫৮০ সালে তাঁর ধর্মমতের কারণে বাংলা-বিহারসহ সাম্রাজ্যের কয়েকটি অংশে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলার ধর্মীয় নেতা মীর মইজুল মুলক, জৈনপুরের কাজী মোঃ ইয়াজদী আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব বাহাদুর ও মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গীরগণ বিদ্রোহ করে আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিমকে সম্রাট পর্যন্ত ঘোষণা করা দেন। কিন্তু প্রকৃত জনসমর্থন ও ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক অংশগ্রহণের ফলে সকল বিদ্রোহ দমিত হয়ে আকবর এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

সার্বিক বিচারে আকবর ছিলেন একজন বিরল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মহামতি সম্রাট। কিন্তু ধর্মীয় নীতির প্রশ্নে তিনি একজন বিতর্কিত সম্রাটও বটে। এর একমাত্র কারণ হলো ধর্ম নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা, পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও অভিক্রিয়া চালান। যেখানে গতানুগতিক পথ ও পূর্বজনদের মত অনুসরণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন মহল থেকে আলোচনা, সমালোচনা এবং বিভিন্ন ধরনের অপবাদ, অপব্যাখ্যা আসতে থাকে। যেমন,

১. আকবরের সমালোচক এবং হিন্দু-বিদ্বেষী আব্দুল কাদের বদায়ূনি তাঁর *মুন্তাখাব-আত-তাওয়ারিখ* গ্রন্থে দ্বীন-ই-ইলাহি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করেছেন।

২. সমকালীন পশ্চাৎপন্থী আলিম সমাজ সম্রাটের প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁকে ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে হেয় করার অপচেষ্টা করেছে।

৩. বাংলা ও বিহারের কাজী কর্তৃক আকবরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দান, শায়খ আহমদ সরহিন্দির নেতৃত্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন হয়েছে।

৪. যেসুইট ধর্মযাজক ফাদার মনসারেট, রিডেলফু একুয়াভিভ, দ্বিতীয় মিশনে আগত ফাদার ড্যানিয়েল বারটুলি এবং ১৫৯৪ সালে তৃতীয় মিশনের সফরসঙ্গী ফাদার জেরোমি জাভিয়ার প্রমুখ খ্রিস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচার ছিল।

৫. যেসুইট ধর্মযাজক ও পর্যটকদের মতামত গ্রহণ করে অনেক দ্বৈতীয়িক গ্রন্থের লেখক, যেমন- ভিন্সেন্ট স্মিথ, ব্লকম্যান, ইগনাগ গোল্ডজিহার, ডাবল্যু হেইগ, এডওয়ার্ডস্ ও গ্যারেট, স্যার এস এ এ রিজভী, মুজিব, আই এইচ কোরাইশী, আর এস শর্মাসহ অনেক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ঐতিহাসিক আকবরের ধর্ম-সমন্বয় কর্মকাণ্ডসহ দ্বীন-ই-ইলাহির ব্যাপক সমালোচনায় মুখর থেকেছেন।

তবে উদারপন্থী প্রায় সব ঐতিহাসিক এবং অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক বদায়ূনিসহ অন্যান্য সমালোচকদের সমালোচনা ও বিরূপ অভিমতের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি।

আকবরের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যেসব বিরূপ আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল - দ্বীন-ই-ইলাহি র মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। তার অনুশাসনগুলোও ছিল ইসলাম বিরোধী। মহজরনামা ও ইমাম-ই-আদিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে আকবর একাধারে পোপ ও সিজারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আকবর ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞজন বা সুপণ্ডিত ছিলেন না। তাই তাঁর পোপের মত অভ্রান্ত ঘোষণা হাস্যকর এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আকবর শেষ পর্যন্ত মুসলিম ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পেগান ছিলেন। ১৫৮২ সালের পর তিনি সূর্য ও অগ্নি উপাসনা শুরু করেন। শিষ্যদের চার প্রকার (জান, মাল, দ্বীন ও নামুস) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিতেন। একই সাথে সম্রাট পুজো (Emperor Cult) প্রচলন করেন। বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণে বেশ কিছু নিয়ম নিজের মধ্যে ও দরবারে চালু করেছিলেন। যা প্রকৃতই ইসলামিক সংস্কৃতির বিপরীত ছিল। এক্ষেত্রে Vincent Smith এর বক্তব্য নিম্নরূপ, "The whole scheme was the outcome of ridiculous vanity, a mantrous growth of unstained autocracy" (Smith, 1917:215). তিনি অন্যত্র বলেছেন "It's extend the autocracy of Akbar from the temporal to the spiritual side, and make him Pope as well as king" (Smith, 1917:278)।

বস্তুতপক্ষে দ্বীন-ই-ইলাহি দিয়ে সম্রাট আকবর প্রকৃত কী বলেছিলেন, কী বুঝিয়েছিলেন, বা কী বলতে চেয়েছিলেন, তার কোন বিশদ বা পক্ষপাতমুক্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। রাজ দরবারে তখন প্রধানত রক্ষণশীল ও মুক্তচিন্তাপন্থী এ দু'টো দল কার্যকর ছিল। দরবারের বাইরে সুফি মরমীবাদ, মাহদী আন্দোলন, রোশনিয়া আন্দোলন ও একেশ্বরবাদী ভক্তি আন্দোলন, পাশাপাশি শিয়া-সুন্নি, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, প্রভৃতি উপাদানসমূহ আকবরের অনুসন্ধিৎসু, বিচক্ষণ ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসু প্রবণতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে তুলেছিল। যে কারণে তিনি এবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রধান লক্ষ্য- সত্যের সন্ধান ও নিরূপণ এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মের মূলনীতি সংগ্রহ ও প্রচার করে ঐশ্বরিক উৎস খুঁজে পাবার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তা অনেকটা ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী পদক্ষেপ মহজরনামা ও সর্বশেষ দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। যে কারণে আকবরের ধর্মমত নিয়ে সঠিক ও নির্মোহ মূল্যায়ন করা অনেকটা দূরহ ব্যাপার। আকবরের সমসাময়িক কয়েকটি তথ্যসূত্রের ওপরই সার্বিক

মূল্যায়ন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যা পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ কেন্দ্রিক কিংবা দ্বিতীয় সূত্রে শোনা বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কাজেই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক তত্ত্ব-তথ্য, সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাবলি, সামাজিক উপাদান সমূহের সমন্বয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ মূল্যায়ন আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটের নিরিখে দেখা যায় আকবরের কট্টর সমালোচক বদায়ূনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি। তিনি আলিম, সুফি, শিয়া, হিন্দু, খ্রিস্টান সবার সমালোচনা করতেন (Mujib, 1968:138-140)। এমনকি তিনি বীরবলকে জারজ ও শিয়াদের ধর্মত্যাগী বলে অভিহিত করতেন। তিনি আবুল ফজলকে সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। ফৈজি ও শেখ মোবারক এর পরামর্শে দ্বীন-ই-ইলাহি প্রচার করা হচ্ছে মনে করে তিনি সম্রাটের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সমালোচনায় মেতে উঠেন। তাই একজন বিদ্বেষ-প্রবণ ও রাজ দরবারে অনুপস্থিত ব্যক্তির বক্তব্য মোটামুটি অনির্ভরযোগ্য। ঐতিহাসিক মাপকাঠিতে তথ্যভিত্তিক নয় বিধায় অগ্রহণযোগ্যও। সমসাময়িক তথ্যানুসারে তা ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসুত ও বাস্তবভিত্তিক নয় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। মহজরনামার বক্তব্যে নিশ্চিত করা হয় যে, সম্রাটের আদেশ বা সিদ্ধান্ত কোরানের নির্দেশ মোতাবেক ও জাতির স্বার্থের অনুকূলে থাকবে। তাই ধর্ম বিষয়ে সম্রাটের যেকোনো আদেশ দেশের আপামর জনগোষ্ঠী মানতে বাধ্য থাকবে বলে ঘোষণার মধ্য দিয়ে আকবর ধর্মীয় নেতা এবং ব্যাখ্যাকারী কিংবা মুজতাহিদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিগণ যুগপথভাবে আকবরকে স্ব-ধর্মে আকৃষ্ট করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। সবার প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব এমনভাবে প্রকাশিত হতো যে তা দেখে প্রত্যেক ধর্মের লোকজন সম্রাটকে নিজ নিজ ধর্মের অনুসারী মনে করতে থাকেন। বদায়ূনির মত ঈর্ষান্বিত যেসুইট পাদ্রীগণও আকবরকে খ্রিস্টধর্মে প্রভাবিত করতে না পেরে ইসলাম ত্যাগী হিসেবে পরিগণিত করবার অপচেষ্টা চালান (Smith, 1917:215)। R C Majumdar এই প্রসঙ্গে Von Noer উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "Von Noer, the German historian of Akbar, gives a correct estimate of the Divine Faith when he writes: "Badauni certainly takes very opportunity of raking up the notion of Akbar's apotheosis for the purpose of renewing attacks upon the great emperor" (Majumdar, 1967:452)।

বাস্তবিক অর্থে সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে একটি দার্শনিক সূত্রে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সংঘ স্থাপনের লক্ষ্যে দ্বীন-ই-ইলাহিকে একটি ধর্মভিত্তিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রচলনের প্রচেষ্টা চালান। এর কোন ধর্মগ্রন্থ, কোন অনুশাসন, উপাসনাগার কিংবা কোন নবী বা প্রচারক ছিল না। আকবরও ইসলামের মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কখনো ধর্মচ্যুত হননি। এটি অনস্বীকার্যও বটে (Ali Yusuf, 1915:354)। মূলত ধর্ম যেন কোনক্রমেই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে সর্বদা তিনি সক্রিয় থেকেছেন। যে কারণে সম্রাটের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যই মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়তে, রাজপুতকে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মোগল-ভারত সর্বোচ্চ শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। আকবরের রাজতান্ত্রিক আদর্শ তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার উপর স্থাপিত হয়েছিল। তিনি হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত ও সম্মিলিত আনুগত্যের উপর সিংহাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামি শরীয়তী শাসনের নীতি ত্যাগ করে জাতীয় নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্রাটের অনুকূলে আশ্রিত প্রজাভক্তদের আধ্যাত্মিক পদপ্রদর্শন অত্যাবশক। হিন্দু-মুসলিম উভয়ের বিশ্বাসও ছিল, সম্রাট হলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁর মধ্যেই প্রেম ও জনকল্যাণ নিহিত। তাই আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে সম্রাটের অবস্থান প্রশ্নাতীত। সুতরাং তিনি যে নিজেকে "সম্রাট পুজো"র আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান তা কখনো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করেনি। বরং তা অনেকাংশে সময়োপযোগীও ছিল।

তাছাড়া তাঁর প্রতি নির্ধারিত আনুগত্যের মাত্রাও সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিকতার খোলসে নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে হয়তো। এই নির্ণায়কে হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমমর্যাদা, সমসুবিধা প্রদান করে উভয় জনগোষ্ঠীর প্রজা-সাধারণের সম-জনপ্রিয়তা অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। এজন্য এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন "He was an intreped soldiers, a great general, a wise administrator a benevolent ruler, and a sound judge of character" (Edwards and Garrett, 1930:53)।

একই সাথে উল্লেখ্য যে, সুলতানি আমলে হিন্দুরা প্রশাসনে ও সেনা বিভাগের নিম্নতর পদগুলিতে যোগদানের সুযোগ পেলেও কখনো তারা সরকারি নীতি নির্ধারণের কাজে অংশীদার হতে পারত না। সুলতানরা হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস ও জীবনধারায় সাধারণত বাধাগ্রস্ত না করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের সমমর্যাদা দিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তৈমুর বংশের প্রত্যক্ষ রক্তধারা ও চেঙ্গিস খানের পরোক্ষ রক্ত প্রবাহ বহনকারী তুর্কি বংশোদ্ভূত আকবর ঘটনাচক্রে ভারতীয় মাটিতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দেহে কোন ভারতীয় রক্ত ছিল না। ভারতীয় সমাজে আকবর বিদেশি ও বিধর্মী শাসক হলেও তিনি জাতীয় নীতি গ্রহণ করে ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন স্বদেশী (ভারতীয়) শাসকে পরিণত করেছিলেন। অনেকে বলে থাকেন আকবর শের শাহের দৃষ্টান্ত থেকে অনেকটা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু শের শাহের রাজনীতিতে ব্যবহারিক দিকটার প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর আকবরের শাসনে ব্যবহারিক ছাড়াও মহত্ব, উদারতা, গভীরতা এবং সর্বোপরি ধর্ম-সহিষ্ণুতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মৌলিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁর অসাধারণ ও সাহসী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দেখা যায়, তীর্থকর, জিজিয়া কর, হিন্দু-মুসলিম প্রজাদের অতিরিক্ত কৃষি কর, মুসলিম প্রজাদের ধর্ম কর প্রভৃতি বিলোপ করেন। যুদ্ধ-বন্দীদের দাসে পরিণতকরণ ও মোঘল 'হারেমে' রাজকন্যাদের প্রেরণ প্রথা রহিত করেন। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, শিশুকন্যা হত্যা, পণ প্রথাসহ বহুবিবাহ ও অতিরিক্ত মধ্যপান নিষিদ্ধ করেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে নিজে অংশগ্রহণ করে পরস্পরের যোগদানে উৎসাহ প্রদান করতেন। হিন্দুদের সরকারি কর্মে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে যোগ্যতানুসারে অবাধ অংশগ্রহণ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নিজ নিজ অনুষ্ঠানাদি পালন নিশ্চিত করেন। তীর্থযাত্রীদের বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন। বিশেষত মুসলিম হজ্জ পালনকারীদের জন্য নতুনভাবে জাহাজ নির্মাণ ও যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে এক নব কৃষ্টির শুভ সূচনা করেন। যা দ্বীন-ই-ইলাহি নামক এক বিপ্লবাত্মক কর্মসূচির ভিতর দিয়ে প্রতিফলনের প্রচেষ্টা চালান। R P Tripathi এ বিষয়ে বলেন "Akbar was the greatest king which historic India had ever had. He was at once the child and the faith of his age. Taken altogether it may safely be said that Akbar was one of the greatest king of all times" (Tripathi, 1963:336)।

ষোড়শ শতকে তাঁর সমসাময়িক তিন বিশ্ব নেতা পারস্যের মহামতি শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রি:), ফরাসি রাজ চতুর্থ হেনরি (১৫৯৪-১৬১০ খ্রি:) এবং বৃটেনের রানী প্রথম এলিজাবেথ (১৫৯৮-১৬০৩ খ্রি:) অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শাসনতান্ত্রিক প্রতিভা ও সামাজিক সংস্কারক হিসেবে সম্রাট আকবর (১৫৫৬ ১৬০৫ খ্রি:) অনেক বেশি কীর্তিমান ছিলেন। আকবর ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কই ছিলেন না, বরং সমকালীন ইতিহাস তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল। স্মিথ তাঁর ধর্মনীতি নিয়ে প্রচণ্ড রকম সমালোচনা করলেও সার্বিক বিচারে তিনি বলেন "He was a born king of men with a rightful claim to rank as one of the greatest sovereigns known to history" (Smith, 1917:353)। সর্বসম্মতভাবে "Akbar the Great Mughal" হবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিকসহ সামগ্রিক

সফলতার পেছনে ধর্মীয় সমন্বয়নীতি সমকালীন ভারতীয় জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে সম্রাট আকবর ধর্মীয় সম্প্রীতির সমুজ্জল রোল মডেল ছিলেন।

আকবরের পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হলেও পিতার অনুসৃত নীতি সুচারুরূপে চলমান রাখার মতো যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না। আকবরের ভাবশিষ্য এবং তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতা নীতির ধারক-বাহক হিসেবে যে দুজন-(জাহাঙ্গীর পুত্র খসরু ও শাহজাহান পুত্র দারাশিকো) কীর্তিমান উত্তরসূরীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন, কালের নির্মম আঘাতে অকালেই নক্ষত্র দুটোর পতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে R. C. Majumder and others বলেন "Khusrav and his nephew, Dara Shukoh, and two pathetic figures in Mughal history" (Majumdar, 1967:457)। ফলে ভারতীয় জনগণও ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে বেশি দিন একতাবদ্ধ থাকতে পারেননি। জাহাঙ্গীরের আমলে পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন দেবের মৃত্যুর ফলে আকবরের জাতিগত মিলনমেলায় অশুভ সূচনার সূত্রপাত ঘটে।

আকবরের পৌত্র সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালকে প্রায় সব ঐতিহাসিক নানা কারণে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দেন। যেমন V. D. Mahajan বলেন, "Undoubtedly, Shah Jahan was one of the greatest rulers of the Mughal and his reign has rightly been called the Golden Age of the Mughals" (Mahajan, 1991:154). MD Mohar Ali 'র মতে, "His reign of thirty years marks the climax of the Mughal dynasty and empire" (Ali. M, 1969:274). S M Edwards and H L O Garrett also said The reign of Shah Jahan, which covers nearly thirty years, from 1627 - 1658 is usually regarded as the golden period of Mughal rule (Edwards and Garrett, 1930:99)। কিন্তু সম্রাট শাহজাহান হিন্দু রাজপুত মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আকবর ও জাহাঙ্গীরের উদার ধর্মীয় নীতি তাঁর আমলে অনেকটা ভাটা পড়ে। জাহাঙ্গীরের আমলে জন্ম নেয়া নতুন মুসলিম রক্ষণশীল মৌলবাদ শাহজাহানের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে উগ্রবাদী আচরণ প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ইসলামি সংস্কৃতি চালু করে। হিন্দুদের উত্থান ঠেকাতে মন্দির ধ্বংসসহ বিভিন্ন হিন্দু সংস্কৃতি বিরোধী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। শিখ-মুসলিম বিরোধও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। শাহজাহানের ধর্মীয় নীতি বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের আমলে যে গোঁড়া ধর্মীয়নীতি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, শাহজাহানের আমলে তার সূত্রপাত ঘটে। শাহজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবও গুণধারী সম্রাট ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বার্নিয়ার বলেন "This prince is endowed with a versatile and rear genius, that he is a consummate Statement and a great king" (Barnier, 1916:199). কীন এর উদ্ধৃতি দিয়ে S M Jaffar বলেন "The abilities of Shah Jahans son and successors, Alamgir reendered him the most famous member of his famous house" (Jaffar, 1936:377)। এছাড়াও মুসলিম সমাজে তিনি জিন্দাপীর কিংবা Darvish clad in the Imperial purple হিসেবে ভূষিত হলেও তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটদের মতো রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। আকবরের আমল থেকে মোগল সাম্রাজ্যের ইমারত চারটি বিশেষ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল। যথা (ক) সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা (খ) ধর্মসহিষ্ণুতা ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমতা নীতি (গ) রাজপুত মিত্রতা নীতি (ঘ) শক্তি-সাম্য রক্ষা। আওরঙ্গজেব এর মধ্যে প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভকে ভেঙে ফেলেন। ফলে নড়বড়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আকবর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়েও একমাত্র ধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সমদর্শিতা নীতি দ্বারা একক জাতি গঠন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের সূচনা করে মোগল শাসনকে স্বজাতি-স্বদেশী শাসনে রূপান্তরিত করে নিজেকে "Father of Indian Nationalism"এর আসনে অধিষ্ঠিত করেন। বহু-জাতি ও বহু-ধর্ম অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বিজয়ী তুর্কি জাতির একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করে আকবর একটি সম্মিলিত দেশ ও একটি সংঘবদ্ধ জাতিকে শাসন করতে আগ্রহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ম্যালিসন বলেন-"Akbar's great idea was the union of all Indian under one head" (Malleson, 1894:196)। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস, উদারতা ও ধর্ম সহিষ্ণুতার দিক থেকে আকবরের প্রপৌত্র ও একমাত্র প্রতিভু 'শাহ্ বুলন্দ ইকবাল' (Lord of Exalted Fortune) উপাধিপ্রাপ্ত দারাশিকোকে উৎখাত করে আওরঙ্গজেব ক্ষমতা গ্রহণ করে ইসলামি নীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর দরবারে ইরানি, তুরানি ও হিন্দুস্তানি কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। রক্ষণশীলদের চাপে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তাঁকে 'গাজী' ও 'ইসলামের রক্ষক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুই এর মত Act of Uniformity বা একই ধর্ম ও একই রাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ফলে চারিদিকে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। অতঃপর ২৭ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত এ দাক্ষিণাত্য তাঁর ও সাম্রাজ্যের সমাধিস্থলে পরিণত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে ,বহু শতাব্দী ধরে ইতিহাস মাত্র একজন আকবরের জন্ম দেয়। তাই জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব কিংবা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত ১৫ জন সম্রাটের মধ্যে কারো পক্ষে আরেকজন আকবর হয়ে উঠা কখনো সম্ভবপর হয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে আকবর একটি ক্ষুদ্র ও মৃতপ্রায় রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। শক্তির জোরে সব রাজা-বাদশাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে অনেক ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা থাকে না। মহামতি আলেকজান্ডারও তৎকালীন পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জয় করে নিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর বিশাল ভারতবর্ষ মোগল শাসনাধীনে এনেছিলেন। কিন্তু তিনি উদার ধর্ম-দর্শন ও জন-সহিষ্ণুতা নীতি দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে শুধু মোগল শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাননি, হিন্দু-মুসলমান জাতিকেও নতুন করে দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথে চলে হিন্দু-মুসলিমসহ সকল জনগোষ্ঠী মোগল ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ থেকে সমন্বিতভাবে বসবাস করে আসছিল। ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে এতে নতুন করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তাদের Divide and Rule নীতির প্রতিফলন হিসেবে শুরু হয় সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলিম সংঘাত। অতঃপর হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যা ১১৯২ সালের পর থেকে বিশাল ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম শাসন চলমান থাকলেও কখনো বড় আকারে ধর্মীয় হানাহানির পাদুর্ভাব দেখা যায়নি। বিশ্বব্যাপী এ ধর্মীয় সংঘাতের প্রেক্ষিতে উত্থান ঘটে উগ্রবাদের। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনীতির আড়ালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিধন- যেমন গত শতকে সার্বিয়া কর্তৃক বসনিয়া-হারজেগোভেনিয়ায় নির্বিচার গণহত্যা, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নিধন ও বাস্তুচ্যুতকরণ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ইন্ধনে রাশিয়ার বিপরীতে আফগানিস্তানে তালেবান শক্তির উত্থান, ও ধর্মীয় অরাজকতা সৃষ্টি, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বে ধর্মীয় সহিংসতার উত্থান, ২০১৬ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং বর্তমান 'এনআরসি'র কারণে শুধু আসাম রাজ্যের ৪০ লক্ষ নাগরিকের "না-নাগরিক" (নাগরিকত্বহীন) হওয়া (বসু, ২০২৪:৯০), কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় শাসনের নামে অত্যাচার, বাংলাদেশে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘাত, ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনে নির্বিচার গণহত্যা, (গাজা ও পশ্চিম তীর অবরুদ্ধ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা ২০২৩-২০২৪) সব ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মীয় ও জাতিগত নির্যাতন, নিপীড়ন, বর্তমান

বিশ্ব-পরিস্থিতিকে অসহনীয়, অনিরাপদ ও বাসযোগ্যহীন করে তুলেছে। তাই শান্তিময় পৃথিবী বিনির্মাণে একজন সমতাদর্শী নীতি প্রয়োগকারী শক্তিশালী আকবরের খুবই প্রয়োজন। যার যুগোপযোগী ধর্ম-সহিষ্ণু আচরণ, সবধর্ম সমন্বয়ের রূপ পরিগ্রহ করে সকল সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সহায়ক অবদান রাখতে পারে। আকবরের ধর্মীয় দর্শন "সূলহ্-ই-কুল" নীতি যেভাবে সংহতি অর্জনে সফলকাম হয়েছিল, তেমনি বর্তমান ধর্মীয় অরাজক বিশ্বেও আকবরের ধর্ম-দর্শনের অনুষঙ্গ- সংঘাতমুক্ত নির্মল ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টিতে রোল মডেলের ভূমিকা রাখতে পারে। আর ভারতবর্ষে তো বটেই।

উল্লেখপঞ্জি

আবুল ফজল (২০১২)। *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*, অনুবাদ, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মুসা আনসারী (১৯৯২)। *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মৃণাল বসু (২০২৪)। *"না-নাগরিকের ভবিষ্যৎ"* প্রবন্ধ, সাপ্তাহিক বাংলা বিচিত্রা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ০৮, ৩০ মে, ঢাকা।

Ali Yusuf (1915), *Journal of Eastern Indian Association*, July, Delhi.

Ali Mohar (1969), *A Brief Survey of Muslim Rule in India*, Mallick Brothers, Dacca

Ashraf K M (1935), *Life and Condition of the People of Hindustan (1200-1500 AD)*, University of London, London.

Bakshi Nizam Uddin Ahmad (1939), *The Tabaqat-i Akbari*, The Asiatic Society, Calcutta.

Badauni Abdul Kader (1898, 1924, 1925) *Muntakhab-al-Tawarekh*, Trans by G S Ranking (vol.I), W H Lowe (vol. II) & W Haig (vol. III), The Asiatic Society, Calcutta.

Bernier Francois (1916), *Travels in the Mughal Empire, 1635-80*, Trans by A Constable, Oxford University Press, London.

Edwards S M and Garrett H L O (1930), *Mughal Rule in India*, Oxford University Press, London.

Fazl Abul (1907), *Akbar Nama*, Vol. I, Trans by H Beveridge, The Asiatic Society, Calcutta.

Goldzihar I (1917), *Muhammad and Islam*, Trans. K C Seelye, Yale University Press, New Haven.

Jaffar S M (1936), *The Mughal Empire from Babur to Aurangzeb*, S. M. Sadiq Khan, Peshawar.

Kosambi D D (1975), *An Introduction to the Study of Indian History*, Popular Prakashan Ltd. Bombay.

Mahajan V D (1991), *History of Medieval India*, Reprt. S. Chand Publication, New Delhi.

Majumdar R.C., Chowdhury H.C. Ray, and Datta Kalikinkar (1967), *An Advance History of India*, (3rd Edition,) Macmillan, New York.

Majumdar R C and Pusalkar (1969), *History and Culture of the Indian People*, Bhartiya Vidya Bhavan, Delhi.

Malleson G B (1894), *Akbar and the Rise of the Mughal Empire*, Oxford, Clarendon Press, London.

Mujib Muhammad (1968), *"Badauni" in Historians of Medieval India*, ed. Muhibbul Hasan, Routledge, Delhi.

Nigam S B P (1929), *Nobility Under the Sultans of Delhi*, Munshiram Manoharlal, Delhi.

Prasad Ishwari (1958), *A Short History of Muslim Rule in India*, (Revised Edition), The Indian Press Ltd. Allahabad.

Qureshi I H (1962), *The Muslim Community of Indo- Pakistan Subcontinent (610-1947)*, Maaref Printer Press, Karachi.

Rizvi S A A (1987), *The Wonder that was India*, Sidgwick and Jackson, London.

Siddiqui I H (1969), *Some Aspects of Afghan Despotism in India*, Three Man Publication, Aligarh.

Sharma R S (1955), *Indian Feudalism*, (300-1200 AD), Macmillan Publishars India Ltd, Calcutta .

Sharma R S (1963), *The Religions Policy of the Mughal Empire*, Asia Publication House, Lahore.

Smith V A (1917), *Akbar the Great Mughal, (1542-1605),* Clarendon Press, Oxford.

Srivastava Ashirbadi All (1972), *A Short History of Akbar the Great*, Vol.1, Shiva Lal Agarwala & Co. Agra.

Tripathi R P (1963), *The Rise and Fall of the Mughal Empire*, Central Book Depot, Allahabad.